بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (৬ এপ্রিল ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৬ এপ্রিল ২০১২-এর (৬ শাহাদত, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ * الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * (সূরা আলে ইমরান:১৭০-১৭৪)

উপরোক্ত আয়াতগুলোর অনুবাদ হচ্ছে, আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তুমি কখনো তাদের মৃত মনে করো না বরং তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে জীবিত এবং তাদের রিয্‌ক দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দান করেছেন তারা এতে উৎফুল্ল। আর যারা তাদের পিছনে (দুনিয়ার) রয়ে গেছে (এবং) এখনো তাদের সাথে এসে মিলিত হয়নি এদের সম্বন্ধেও তারা সুসংবাদ পায়। এদেরও কোন ভয় নেই এবং এরা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থও হবে না। আল্লাহ্‌র পথ থেকে তারা অনুগ্রহ ও আশিস লাভের সুসংবাদ পায় এবং এ (সুসংবাদও পায়) আল্লাহ্ মু'মিনদের পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না। আহত হবার পরও যারা আল্লাহ্ ও এ রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের মাঝে যারা ভালভাবে দায়িত্ব পালন করেছে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে এদের জন্য রয়েছে এক মহা পুরস্কার (অর্থাৎ) যাদেরকে লোকেরা বলেছিলো, নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন জড়ো হয়েছে। অতএব তোমরা তাদের ভয় কর। কিন্তু এ (কথা) তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিল এবং তারা বললো, আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কার্যনির্বাহক।

পাকিস্তান এবং তাদের প্রভাবে অন্য কয়েকটি দেশের মোল্লারা ও তাদের সরকার মনে করে যে, আহমদীদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করে, তাদেরকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, মানবাধিকার সংক্রান্ত

আইন সমূহ অগ্রাহ্য করে, সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্যে পরিণত করে, আহমদীদেরকে হত্যা করার জন্য সবাইকে প্রকাশে অনুমতি প্রদান করে এরা আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কিন্তু এটি তাদের ভুল ধারণা। আহমদীয়াত আল্লাহ্ তা'লার স্বহস্তে রোপিত সেই বৃক্ষ যাকে কোন মানবীয় অপচেষ্টায় উৎপাটন করা সম্ভব নয়। এই বৃক্ষের বৃদ্ধি ও ফুলে-ফলে সুশোভিত হবার সুসংবাদ খোদা তা'লা দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম (ঐশী বাণী) হলো: **"বুশরা লাকা ইয়া আহমদী! আনতা মুরাদী ও মা'য়ী, গারাছতু লাকা কুদরাতী ওয়া ইয়াদী।" এর** অনুবাদ হচ্ছে, **'হে আমার আহমদ! তোমার জন্য সুসংবাদ, তুমি আমার উদ্দেশ্য এবং আমার সাথে আছ। আমি নিজ হাতে/স্বহস্তে তোমারূপী বৃক্ষ রোপণ করেছি।'**

অতএব নিঃসন্দেহে এ জামাতকে ধ্বংস করার মানবীয় অপচেষ্টা চলছে এবং চলবে কিন্তু এসব অপচেষ্টায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত ধ্বংস হতে পারে না। যখন উপরোক্ত ইলহামটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাভ করেছিলেন তখন তাঁর চতুষ্পার্শ্বে গুটিকতক ভক্ত ছিলেন মাত্র যারা তাঁর হাতে দীক্ষা নিয়েছিলেন। অথচ আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি আজ আমরা কত মহিমার সাথে পূর্ণ হতে দেখছি! পৃথিবীর দুশ'টি দেশ পর্যন্ত আহমদীয়া জামাত প্রসার লাভ করেছে। নিষ্ঠাবানদের সমন্বয়ে এমন এমন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা দেখে অবাক হতে হয়। বিরোধীদের সব ধরনের অপচেষ্টা সত্ত্বেও, যাতে প্রশাসনেরও ভূমিকা রয়েছে; প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যে উন্নতি হয়েছে তা কি কোন মানবীয় প্রচেষ্টার ফসল হতে পারে? কারো যদি বিবেক-বুদ্ধি থাকে এবং চোখে যদি বিদ্বেষের পর্দা না থাকে তবে এই একটি বিষয়ই আহমদীয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।

এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **কতক এমন লোক মাথাচাড়া দেয় এবং দাবী করে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের স্বপ্নে জানিয়েছেন বা আমাদের প্রতি ইলহাম হয়েছে, 'মির্যা সাহেব মিথ্যাবাদী। তিনি বরং অন্য ধর্মাবলম্বীদের উদাহরণ দিয়েও বলেছেন, তারাও বলে- আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জানিয়েছেন, 'আমাদের ধর্ম সত্য এবং ইসলাম মিথ্যা' নাউযুবিল্লাহ্'।** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'এমনও অসংখ্য লোক রয়েছেন যারা বয়আত করেছেন এবং এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের অবহিত করেছেন এবং পথের দিশা দিয়ে বলেছেন, এই ব্যক্তির মসীহ্ মওউদ হওয়ার দাবি সত্য।'** বরং আজও শত শত মানুষ স্বপ্নে পথনির্দেশনা পেয়ে বয়আত করেন। বর্তমানে আমরা স্বয়ং এর জ্বলন্ত সাক্ষী। এমন অনেক ঘটনা আমি উপস্থাপন করেছি। বরং এখানেই হয়তো আমার সম্মুখে এমন অনেক লোক হবেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পথ দেখিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্পষ্ট করে বলেছেন, **'আল্লাহ্ একাধিক হতে পারেন না যে, কাউকে কিছু বলবেন আর কাউকে অন্য কিছু আর বিভিন্ন জনকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পথ দেখাবেন। তাঁর একটি মানদন্ড আছে। কেউ একে যাচাই করতে চাইলে যাচাই করে দেখতে পারে, আর এটিই একমাত্র মাপকাঠি'**।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, **'আমি তোমাদের বলছি সেই মানদন্ডটি কী? তোমরা দেখো! আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার কি বলে? এও স্বপ্ন দেখেছে সেও স্বপ্ন দেখেছে, এখন দেখো আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্য কি বলে? এ দৃষ্টিকোন থেকে জামাতের উন্নতি বলে, আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্য আহমদীয়া জামাতের অনুকূলে রয়েছে। বর্তমানে আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের খলীফার হাতে ঐক্যবদ্ধ হওয়াটাও আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় একটি সাক্ষ্য। নিঃস্বার্থভাবে** (জামাতের সদস্যদের) **প্রাণ, ধন ও সময়ের কুরবানীর কথা সকল অ-আহমদী স্বীকার করে। এগুলো কি তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্য নয়, যিনি জগদ্বাসীর অত্যাচার সত্ত্বেও হৃদয়গুলোকে একসূত্রে দৃঢ়ভাবে গেঁথে ত্যাগের প্রেরণা জুগিয়েছেন'?**

অতএব বিরোধীদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা— জামাতের শক্তি অর্জন, বিস্তার ও উন্নতিকে প্রতিহত করতে পারবে না। প্রতিটি জীবন যা আহমদীয়াত, কালেমা তৈয়্যেবা, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা এবং আল্লাহ্ তা'লা,

আর শুধু আল্লাহ্ তা'লার দাসত্ব বরণের জন্য উৎসর্গ হচ্ছে তা বজ্রনিনাদে ঘোষণা করে যে, তোমাদের সকল ষড়যন্ত্র, নিপীড়ন ও নির্যাতন আহমদীয়া জামাতের উন্নতিকে প্রতিহত করতে পারবে না। জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাসে শহীদ হযরত মৌলভী আব্দুর রহমান খাঁন সাহেব এবং শহীদ হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবের শাহাদতের মাধ্যমে জীবন উৎসর্গের শুভসূচনা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, **'শহীদ মরহুম মৃত্যুবরণ করে আমার জামাতকে একটি দৃষ্টান্ত উপহার দিয়েছেন। সত্যিকার অর্থে আমার জামাত একটি বড় দৃষ্টান্তের মুখাপেক্ষী ছিল'**। পরে একই বিষয়ের উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, **'আমি খোদা তা'লার প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞ! কেননা এমন সদস্যও রয়েছেন যারা বিশুদ্ধচিত্তে ঈমান এনেছেন, নিষ্ঠার সাথে এ পথ অবলম্বন করেছেন এবং এ পথে সব ধরনের দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে প্রস্তুত রয়েছেন'**।

কিন্তু যে দৃষ্টান্ত এ বীরপুরুষ অর্থাৎ সাহেবযাদা সাহেব স্থাপন করেছেন আজও জামাতের (সংখ্যাগরিষ্ঠের) পক্ষ থেকে সে শক্তি প্রকাশ পাওয়া বাকী আছে। তিনি (আ.) বলেন, **'খোদা সকলকে সেই ঈমান ও সে দৃঢ়তা দান করুন যার দৃষ্টান্ত এ শহীদ মরহুম রেখে গেছেন'**।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উক্ত দোয়াকে যা শেষ বাক্যে রয়েছে, গ্রহণ করেছেন এবং অনেককে সেই অবিচলতা দান করেছেন যার কল্যাণে তারা যথাসময় জীবন উৎসর্গ করেছেন। পূর্ববর্তী শহীদদের ত্যাগের সেই ধারাবাহিকতা সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে আছেন পাকিস্তানের আহমদীরা এবং তাদের মাঝে শত শত মানুষ এই ত্যাগ স্বীকার করেছেন। প্রত্যেক শহীদ স্ব স্ব ঈমানের উষ্ণতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন। প্রত্যেক শহীদ ঈমানের প্রেরণা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন আহমদীয়াতের প্রত্যেক শহীদের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে যাতে সজ্জিত হয়ে সে তার প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। যাদের মাঝে ইন্দোনেশিয়া, ভারত এবং অন্যান্য দেশের শহীদরাও অন্তর্ভূক্ত আছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বিশেষ ভাবে সামনে এসে যান। ১৯৭৪ সালে জামাতে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে যে নৈরাজ্য মাথা চাড়া দেয় তাতে ৩০/৩৫ জন আহমদীকে শহীদ করা হয়েছিল, কিন্তু অনেককে উপর্যুপরি নির্যাতন করে হত্য করা হয়। পিতা-পুত্রকে শহীদ করা হয়েছে। পিতার সামনে পুত্রকে নির্যাতন করা হয়েছে। পুত্রের সামনে পিতাকে নির্যাতন করতে করতে বলা হয়েছে, আহমদীয়াত থেকে ফিরে আসবি কি না বল? আর এসব কিছু কেবল সাধারণ মানুষই করছিল না বরং সেখানকার পুলিশও সামনে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। ইন্দোনেশিয়াতে প্রকাশ্যে পুলিশের তত্ত্বাবধানে সন্ত্রাসের লক্ষ্য বানানো হয়েছে, পুলিশ ও রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যোগসাজশে পালাক্রমে নির্যাতন করে করে আহমদীদের শহীদ করা হয়েছে কিন্তু ঈমানের সুরক্ষাকারীগণ এবং অবিচলতার মূর্তীমান প্রতীকরা দেহের প্রতিটি স্থানে, শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আঘাত আসতে দিয়েছেন কিন্তু স্বীয় ঈমানকে নষ্ট হতে দেন নি।

কাজেই পাকিস্তানের সংবিধান হোক বা ইন্দোনেশিয়ার অথবা অন্য যে কোন দেশের হোক, আহমদীদের প্রাণ হয়তো তারা কেড়ে নিতে পারবে কিন্তু তাদের বিশ্বাস কেড়ে নিতে পারবে না। শুনেছি, বর্তমানে মালয়েশিয়াও একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে উক্ত কাতারে যোগ দিচ্ছে বরং এসেই গেছে। তারা বর্তমানে একটি নুতন আইন করেছে যা প্রকাশিত হচ্ছে। তারাও পরীক্ষা করে দেখে নিক। স্মরণ রাখবেন! যখন খোদা তা'লার তকদির স্বমহিমায় কাজ শুরু করবে তখন হিসাব দেয়া কঠিন হয়ে পড়বে। তখন কোন মোল্লা বা কোন সংবিধান তাদেরকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসবে না বরং এসব নামসর্বস্ব মোল্লা যারা রহমাতুল্লিল আলামীন (সা.)-এর নামকে কলঙ্কিত করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় লিপ্ত, তাদেরকে সর্বপ্রথম অপরাধীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। তখন আহমদীদের ঈমান ও ধৈর্য্য এবং দৃঢ়তা একান্ত মহিমার সাথে জ্বলজ্বল করবে।

তাই আহমদীদের এ বিষয় নিয়ে দুঃশ্চিন্তা নেই। তারা জানে, অবশেষে বিজয় তাদেরই। জাতিগতভাবে ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়, তারাও কুরবানী দিচ্ছে, কিন্তু এ সকল ত্যাগের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করা। তাই আহমদীরা এই যে ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং আজও করে চলছে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে; তা কোন উদ্দেশ্যবিহীন এবং সাধারণ মানের কুরবানী নয়। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার এবং বর্বরতার উপাখ্যান রচিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারকরা যতই বলুকনা কেন এটি নির্মম সত্য যে, সরকারী কর্মকর্তাগণ নিজেদের ছত্রছায়ায় আজও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। ঐ সকল কর্মকর্তার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ আজও আহমদীদেরকে অত্যাচার ও বর্বরতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে চলেছে।

সম্প্রতি রাবওয়ার পুলিশ যাদের মাঝে থানার ইনচার্জ বা ওসি এবং তার সহকারী আর সংবাদ অনুসারে জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা (ও এর সাথে জড়িত) আমাদের একজন অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ আহমদীকে কোন মামলা ছাড়াই এক মাসের মত থানায় আটকে রাখে। এরপর কোন অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুর নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়। যার ফলে এই নিষ্ঠাবান ও আত্মত্যাগী আহমদী, জনাব আব্দুল কুদ্দুস ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে সকল নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করে আপন প্রভুর সান্নিধ্যে তথা পরপারে পাড়ি দেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। নিঃসন্দেহে তিনি শহীদের পদমর্যাদা লাভ করেছেন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এরূপ, রাবওয়ার নুসরাতাবাদ নিবাসী এক ব্যক্তি আহমদ ইউসুফকে যে আদালতের বাইরে স্টাম্প বিক্রি করতো গত ৪/৫ অক্টোবরের দিবাগত রাতে অজ্ঞাত পরিচয় কেউ হত্যা করে। এরপর পুলিশ নিহতের ছেলের কথায় ও তার ইঙ্গিতে বিভিন্ন লোকদের বিভিন্ন সময় সন্দেহমূলকভাবে আটক করে তদন্তাধীন রাখে। পরে তাদের সবাইকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ ঘটনার বাদী, নিহতের ছেলের পক্ষ থেকে শহীদ মাষ্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের নামও নেয়া হয় আর পুলিশ তাঁকে থানায় ডেকে আটক করে। তিনি নুসরাতাবাদ জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বাদী কোন কারণ ছাড়াই ডি.পি.ও-র কাছে লিখিত আবেদন করে মাস্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেবকে এই মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়। ১০ ফেব্রুয়ারী মাগরীবের নামাযের সময় পুলিশ মাস্টার সাহেবকে মসজিদে এসে গ্রেফতার করে। কিন্তু নিয়মানুযায়ী কোন গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয় নি। যোগাযোগ করলে পুলিশ বারবার একথাই বলে, আমরা জানি ইনিও নির্দোষ। বড় কর্মকর্তারা একথাই বলে যে, শীঘ্রই মামলা নিস্পত্তি হয়ে যাবে এখনো আমাদের কিছু অপারগতা রয়েছে যে কারণে তাকে গ্রেফতার করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ মার্চ মাস্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেবকে পুলিশ রাবওয়া থানা থেকে অজ্ঞাত কোন স্থানে স্থানান্তরিত করে । মাস্টার সাহেব কিছুই জানতেন না তাকে কোথায় রাখা হয়েছে। তাকে নিরুদ্দেশ করার দশ দিন পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ পুলিশ তাকে থানায় ফিরিয়ে আনে এবং মাস্টার সাহেবের এক বন্ধুকে ফোন করে বলে, এসে তোমার লোক নিয়ে যাও। সে অনুযায়ী সেই বন্ধু সেখানে গেলে মাস্টার সাহেব তাকে বলেন, আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল। পুলিশ তখন সেই বন্ধুর কাছ থেকে সাদা কাগজে 'আমি তাকে ফেরত নিয়ে যাচ্ছি' মর্মে লিখিত নিয়ে মাস্টার সাহেবকে তার হাতে তুলে দেয়। মাস্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের অবস্থা ভাল ছিল না তাই সেই বন্ধু তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তখন জানা গেল, নিরুদ্দেশের প্রথম দু'তিন দিন পুলিশ মাস্টার সাহেবের উপর চরম দৈহিক নির্যাতন চালায় যার ফলে তার অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটে। তার পায়ুপথ থেকেও রক্ত বেরোতে থাকে, রক্ত বমি হয় একইভাবে তার কিডনিও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়। সাক্ষাতের সময় মাস্টার সাহেব বলেন, ১৭ মার্চ রাতের অন্ধকারে (তার জ্ঞান ছিল কিন্তু আভ্যন্তরিণভাবে ক্ষতবিক্ষত ছিলেন) কিছু পুলিশ তাকে রাবওয়া থানা থেকে এমন স্থানে নিয়ে যায় যেখানে ড্রাইভ করে যেতে ৫/৬ ঘন্টা সময় লাগে। কাঁচা রাস্তা বিধায় দূরত্ব কম হলেও সময় বেশী লাগে। একটি অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায় যা ছিল একেবারে নির্জন আর সেখানে চরম নির্যাতন চালায়। পুলিশরা মারতে মারতে বলতো এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত হিসেবে (জামাতের) কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নাম বল। তুমিও কর্মকর্তা,

নাম বলে দাও আমরা তোমাকে ছেড়ে দিব আর তাকে গ্রেফতার করবো, একই সাথে তারা একটি কাগজে স্বাক্ষর করানোর চেষ্টা করতে থাকে। এই কর্মকর্তাদের মাঝে কয়েকজন নাযেরের নামও তারা উল্লেখ করে এবং অন্যদেরও নাম নেয়। সেই কাগজে মাস্টার সাহেব সাক্ষর করেন নি। প্রহার ও নির্যাতনের সময় পুলিশ বলছিল, এই প্রথম আমরা জামাতী কোন কর্মকর্তাকে হাতে পেয়েছি। পূর্বে এরা হাত থেকে বেরিয়ে যেতো, (এসব বলে) আবার নির্যাতন করা শুরু করে দিত। নির্যাতন করার সময় কর্মকর্তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের নাম নিয়ে জামাতের বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করে। নির্যাতনের কারণে মাস্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে, রক্ত বমি করতে শুরু করেন, যার উল্লেখ পূর্বে করেছি। এ কারণে পুলিশ নির্যাতন বন্ধ করে এবং কিছু ঔষধ পত্র দেয়, অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে পুলিশ তাকে থানায় ফিরিয়ে আনে এবং তাকে তার বন্ধুর হাতে তুলে দেয়। মাস্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেবকে ফযলে উমর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আর সেখানে আই.সি.ইউ বিভাগে রাখা হয়। ক্রমাগতভাবে রক্ত দেয়া হয়। দু'একদিন পর রক্তবমন বন্ধ হয় ঠিকই কিন্তু শাহাদতের একদিন পূর্বে ২৯ মার্চ পুনরায় রক্ত বমি করতে শুরু করেন। যারফলে তার অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল যার কারণে ৩০ মার্চ তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন এবং এ অবস্থায়ই তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

মৃত্যুর পূর্বে তাকে তাহের হার্ট ফাউন্ডেশনেও স্থানান্তর করা হয়েছিল। ডায়লাসিস করার কথা ভাবা হচ্ছিল আর প্রস্তুতিও চলছিল। কিন্তু পুলিশী নির্যাতনের কারণে তিনি যে আভ্যন্তরীণ আঘাত পেয়েছিলেন তা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি আর এভাবে তিনি শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন, এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা তার ভায়রা ভাই লিখেছেন।

তিনি মাস্টার সাহেবের সাথে হাসপাতালে (দেখাশোনার জন্য) ছিলেন। মাস্টার সাহেব বলেছেন, ১৭ মার্চ পুলিশ তাকে রাবওয়া ও চিনিউট থেকে কিছু দূরে "ঝাঙ্গাড় গ□তারাঁ" নামক স্থানে নিয়ে গিয়ে ভয়ঙ্কর নির্যাতন চালায়। (ইনি বলেন, আমি দৃঢ়তার সাথে এসব কথা বলছি কেননা মাষ্টার সাহেব স্বয়ং আমাকে এসব কথা বলেছেন) থানা থেকে হেঁটে তিনি আমজাদ বাজওয়াহ সাহেবের সাথে বাইরে আসেন। এরপর আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। পথিমধ্যে মাস্টার সাহেব বলেন, এরা আমার উপর নির্যাতন চালিয়েছে, ভয়ঙ্কর নির্যাতন করেছে। তিনি বলেন, থানার দারোগা এবং তদন্ত কর্মকর্তাও নির্যাতনে অংশ গ্রহণ করেছে। চিনিউট থেকে পিন্ডি ভাটিয়া রোডে নিয়ে যায়। এরপর "হার সে শেখ" হয়ে নদীর দিকে নিয়ে গেছে। নদীর মধ্য দিয়ে কোনো পথে আমাকে "ঝাঙ্গার গুলতারাঁ" নিয়ে যায়। সেখানে স্থানীয় চেকপোস্টে আমাকে বন্দী করে রাখে। কিছুক্ষণ পর আমাকে হাজত থেকে বের করা হয়। বের হয়ে দেখি, রাবওয়া থানার দারোগা, তদন্ত-কর্মকর্তা, স্থানীয় দারোগা এবং ডি.এস.পি. চেয়ারে বৃত্তাকারে বসে আছে। তাদের হাতে একটা কাগজ ছিলো। তারা বললো, এ হলো তোমার জবানবন্দী এতে দস্তখত করে দাও। এতে সদর আঞ্জুমানের কর্মকর্তা ও সদর উমুমীর বিরুদ্ধে জবানবন্দী লেখা ছিলো। (রাবওয়ায় যে) হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে তাতে এরা জড়িত এবং তারা এ কাজ করিয়েছে। আমি বললাম এতো মিথ্যা, আমি কেন এতে দস্তখত করবো। তারা বললো, তুমি দস্তখত করলে আমরা তোমায় ছেড়ে দিব। তিনি বলেন, আমি দস্তখত করতে অস্বীকার করলাম। আমি বললাম এ আমার জবানবন্দী নয় আর এমনটি ঘটেও নি তাই আমি কীভাবে দস্তখত করতে পারি? তারা আমাকে হুমকী দেয়, স্বেচ্ছায় দস্তখত দিলে বেঁচে যাবে নতুবা আমরা এ কথা তোমাকে দিয়ে বলিয়েই ছাড়বো। মাস্টার সাহেব বলেন, আমি দু'বার অস্বীকার করার পর সাথে দাঁড়ানো অসুরের মতো দু'জন মানুষ আমাকে মাটিতে ফেলে মারতে শুরু করে, ক্রমাগত মারতে থাকে এবং তারা দস্তখতের দাবী পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। বিভিন্ন পন্থায় নির্যাতন চালানো হয়। (নির্যাতনের বিবরণ দিতে গিয়ে) তিনি কিছু শব্দ লিখেছেন। রশি দিয়ে বেঁধে শাস্তি দেয়া, রড দ্বারা অত্যাচার করা, রোলার চালনা

প্রভৃতি নির্যাতনের বিভিন্ন উপকরণ রয়েছে। শুইয়ে দেহের উপর কাঠের রোলার চালানো হয়। এটি খুব বড় আকৃতির ও খুব ভারী হয়ে থাকে যা দেহের উপর চালানো হয়। অনুরূপভাবে রশি দিয়ে বাঁধা হয়। রশি দিয়ে বেঁধে মাটিতে হেঁচড়ানো হয়। এছাড়া ক্রমাগত জাগিয়ে রাখে। ঘুমে চোখ বন্ধ হবার উপক্রম হলেই আমাকে ঘরের বাইরে বের করে মারতে শুরু করতো। সেখানে এক কুখ্যাত ডাকাতও ছিল। সেও সাথে ছিল। পুলিশদের কাছে চামড়ার তৈরী এক প্রকার চাবুক থাকে। মারধর করার জন্য তা ব্যবহার করে। ডাকাতকে পাঁচ বার মারলে আমাকে মারত পঁচিশ বার। একবার শরীর বেশি খারাপ হলে নিকটবর্তী হারসা শেখ গ্রামে নিয়ে যায়। সেখানে বিভিন্ন ইঞ্জেকশন ও ঔষুধ দেয়। শরীর ঠিক হতেই আবার নির্যাতন শুরু করে। থানার দারোগা এবং অন্যরাও এদের সাথে যোগ দিয়েছিল। অকথ্য ভাষায় গালি দিতে দিতে বলতো, এখন তোমাকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য লন্ডন ও রাবওয়া থেকে তোমার নেতাদেরকে ডাক আর এরপর জামাতের সম্মানিত লোকদের গালি দিত। তিনি আমাকে বলেন, গালি শুনে বড়ই মর্ম যাতনা পেতাম। আঘাত সহ্য হচ্ছিল কিন্তু গালি শোনা অসহ্য ছিল। খাবারও যৎসামান্য দিত। তিনি বলেন, এমন অত্যাচার-নিপীড়ন আমি কখনো দেখিও নি, শুনিও নি। আমার মধ্যে এগুলো সহ্য করার মতো এত শক্তি ছিল না। আমি দোয়া করছিলাম যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নিপীড়ন সহ্য করার শক্তি দাও। এরপর আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় করুণায় আমাকে এগুলো সহ্য করার শক্তি দিলেন। সদর উমুমী সাহেব আমাকে (হুযুরকে) লিখেছেন, আমি তাকে বললাম, তারা আপনাকে এত কষ্ট দিয়েছে, নিশ্চয় কিছু লিখিয়ে নিয়ে থাকবে। তিনি খুব আবেগঘন ভাষায় তাকে বলেন, তারা আমার নিকট থেকে একটি অক্ষরও লিখাতে পারেনি।

অতএব এ হচ্ছে ঈমান সুরক্ষাকারী এবং সত্যে অবিচল মানুষের কাহিনী। মূর্তিমান এই সংকল্প ও প্রত্যয়ের প্রতিচ্ছবি! প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য দেননি। আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যাকেও শির্কের সমতুল্য অভিহিত করেছেন। কাজেই এ মহান শহীদ আমাদেরকে অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি এ শিক্ষাও দিয়ে গেছেন যে, তৌহিদ প্রতিষ্ঠা কল্পে জীবনের বাজি রাখতে দ্বিধা করবে না যা আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কেননা মিথ্যাও শির্কের সমতুল্য এবং আমরা কোনভাবেই শির্কে লিপ্ত হতে পারি না। মরহুম শহীদ তাঁর বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন আর যথাযথভাবে রক্ষা করেছেন। শহীদ মরহুম যদি নির্যাতনের মুখে পুলিশের দুরভিসন্ধি অনুসারে বিবৃতি দিতেন যেমনটি তারা চেয়েছিলো, তবে জামাতের জন্য এর পরিণতি সামগ্রীকভাবে খুবই ভয়াবহ হতে পারত; যেমনটি কিনা শহীদ মির্যা গোলাম কাদেরকে তারা নিজেদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার হাতিয়ার বানাতে চেয়েছিল। সেটি ছিলো একটি নাম সর্বস্ব সংগঠন বা সন্ত্রাসী সংগঠন কিন্তু এখানে স্বয়ং পুলিশ তা করতে চেয়েছে। অবশ্য জেলার ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা নির্যাতনের বিষয়টি অস্বীকার করেছে এবং নির্দোষ হবার দাবী করছে। বলছে যে তাদেরকে বাইপাস করে অধস্তন অফিসারদের মাধ্যমে সরকারের উঁচু মহল থেকে কোন নির্দেশ এসেছে যা মানা হয়েছে; এটিও অসম্ভব নয়। প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা কখনো কখনো নির্দেশনা দিয়ে থাকে। জেনারেল জিয়াউল হকের যুগে জিয়া স্বয়ং থানার দারোগাকে ফোন করতো, এক্ষেত্রেও তেমনটি হতে পারে। কারণ প্রাদেশিক সরকারও আমাদের বিরোধী। এখন যখন পুলিশের এসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা চলছে, তখন প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় থেকে বিষয়টি মিটমাট করার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে যে মিমাংসা করে নাও। পাকিস্তানে অপরাধীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, বাহ্যতঃ ন্যায় বিচারের আশা নেই। কিন্তু আইনের ভেতর থেকে জামাত সব ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এবং ইনশাআল্লাহ্ করবে। যাহোক, পুলিশের মনগড়া কোন কাগজে যদি তিনি স্বাক্ষর করতেন তবে এটি ভয়ানক হতে পারত। হত্যার মিথ্যা মামলায় কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করাই ছিল এদের মূল উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় দপ্তর সমূহের উপর বিধিনিষেধ আরোপ হতে পারতো। শান্তিপ্রিয় জামাত হিসেবে আমাদের যে শিক্ষা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা রয়েছে এর দুর্ণাম হতে পারতো। আরও অনেক এমন বিষয় হতে পারতো যারফলে জামাতের ক্ষতির আশংকা ছিল। শুধু দেশীয় পর্যায়েই নয় বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও হতো।

মোটকথা তারা একটা ষড়যন্ত্র করেছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এমন এক নিষ্ঠাবানের মাধ্যমে সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছেন যিনি ব্যক্তি জীবনে খুবই কোমল-হৃদয়ের অধিকারী একজন মানুষ ছিলেন, যিনি এমন কঠোরতা সম্পর্কে ধারণাও রাখতেন না। কিন্তু তিনি তাদের মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এক দৃঢ় পাহাড়ের ন্যায় দাঁড়িয়েছেন। জামাতের উপর কোন ধরনের আঁচ আসতে দেননি।

অতএব হে কুদ্দুস! তোমায় সালাম জানাই। তুমি নিজেকে অবর্ণনীয় কষ্টে নিপতিত করেছ কিন্তু জামাতের সম্মানে আঁচ আঘাত আসতে দাওনি। তুমি নিজের প্রাণ দিয়ে জামাতকে এক ভয়ানক পরীক্ষা থেকে রক্ষা করেছ। অতএব মাস্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেব একজন সাধারণ শহীদ নন, বরং শহীদদের মাঝেও তাঁর মর্যাদা অনেক বড়। এই ক্ষণস্থায়ী জগত ছেড়ে একদিন সবাইকে যেতে হবে। কিন্তু সৌভাগ্যবান মাস্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেব যাঁকে খোদা তা'লা জীবিত আখ্যায়িত করেছেন। আর তিনি এমন জীবিকার ভাগী হয়েছেন যা জাগতিক রিয্ক থেকে অনেক মহান ও উন্নত মানের। যে জামাত ও যে উদ্দেশ্যে তিনি ত্যাগ স্বীকার করেছেন এর প্রকৃত পুরস্কার তিনি ঐ জগতে গিয়ে অবশ্যই পাবেন। মরহুম শহীদ আমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা সর্বদা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। অর্থাৎ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (সূরা আলে ইমরান: ১৭৪) আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি কতই না উত্তম কার্যনির্বাহক।

অতএব এ শিক্ষা তিনি দিয়ে গেছেন যে, অবস্থা যেমনই হোক না কেনো আল্লাহ্র আঁচলকে ত্যাগ করা যাবে না । হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও একইভাবে বলেছেন, **'জগদ্বাসী তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না যদি আল্লাহ্ তা'লার সাথে তোমাদের দৃঢ় সম্পর্ক থাকে'।** আহমদীদেরকে গালি দিয়ে বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে নোংরা ভাষা ব্যবহার করে আমাদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে যাতনা ও কষ্ট দিয়ে আনন্দিত হতে পারো। কিন্তু সেদিন সমাগত যখন যখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে হিসাব নিবেন। মরহুম শহীদ মোটের উপর পাকিস্তানের সকল আহমদীদের আর বিশেষভাবে রাবওয়ার আহমদীদেরকে এ বার্তা দিয়ে গেছেন যে, আইন ও সরকারী কর্মচারীদের প্রতি সম্মান প্রর্দশন করা প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যকীয় কিন্তু কোন মানুষ সে যত বড় পুলিশের কর্মকর্তা বা অফিসারই হোক না কেন ভয় পাবার প্রয়োজন নেই। তারা যত নির্যাতনই আমাদের উপর চালাক না কেনো একজন আহমদীকে ভয় করতে হলে শুধুমাত্র এক সত্তাকেই ভয় করা উচিত আর সে সত্তা হলেন আল্লাহ্ তা'লা। পুলিশ কর্মকর্তাদের শক্তি কেবলমাত্র আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলদের ক্ষেত্রেই চলে। সন্ত্রাসীদের সামনে, মোল্লাদের সামনে যারা ভাঙ্গচুর ও উগ্রতাপ্রিয়, যারা তাদের সামনে ঘুরে দাঁড়ায়, যারা তাদেরকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়, এদের সামনে ভয়ে তাদের বাকশক্তি হারিয়ে যায়। বিগত দিনগুলোতে বিভিন্ন পেশায় জড়িত অ-আহমদী বন্ধুদের সাথে একটি সভা হচ্ছিল, তাতে একজন আমাকে বলতে লাগলেন, আপনার জামাতের একটা বৈশিষ্ট্য হলো প্রত্যেকেই বয়আতের অঙ্গীকার করেছে। আর আপনি যা তাদেরকে বলেন তারা তা মানে আর মানার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, পাকিস্তানের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আপনারা কার্যতঃ কোন প্রদক্ষেপ কেন গ্রহণ করেন না? আমি তাকে বলেছিলাম, আমরা রাজনৈতিক কর্মকান্ডের অংশ হতে পারি না। যেহেতু আইন আহমদীদেরকে বলে-রাজনীতিতে আসার পূর্বে প্রথমে মেনে নাও যে, তোমরা অমুসলিম কেবল তাহলেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ হতে পারবে ভোটাধিকারও এর অন্তর্ভূক্ত। আর এটি আমরা কখনো করবো না, করতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ রাস্তায় পেশী শক্তি প্রদর্শন, উগ্রতা আর সন্ত্রাসও আমরা করতে পারি না কেননা, আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমরা এ যুগের পথপ্রদর্শককে মান্য করে এটিই শিখেছি; যা সঠিক ইসলামী শিক্ষা আর তা হতে আমরা বিচ্যুত হতে পারি না।

অতএব সরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের সঙ্গ দেয় যারা চরমপন্থী বা তাদের ভয় করে যারা উগ্রপন্থী, যাদের হাতে রাজপথ আরা যারা রাস্তায় নেমে আসে। এভাবে রাজনীতিবিদরাও তাদের কথা মানে সে কারণেই আহমদীদেরকে

তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। বয়আত সম্পর্কে আমি বলেছি, বয়আতের কারণেই আহমদীগণ নিজেদের প্রাণ ও ধন-সম্পদের ত্যাগ স্বীকার করে চলছে এবং কোন আইনই নিজের হাতে তুলে নেয় না। অবশ্য একদিন আসবে যখন এসব লোকই আহমদীদের সম্মান করতে বাধ্য হবে। যদিও আজ আমাদেরকে নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু বানানো হচ্ছে। কিন্তু খোদা তা'লা অন্যায় করেন না। হয়ত কিছুকাল তাদের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। কাজেই কেবল খোদা তা'লার সামনেই অবনত হোন তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করুন এবং তাঁর প্রাধান্য বিস্তারী নিয়তির অপেক্ষা করুন।

স্নেহের শহীদ কুদ্দুস সাহেব সম্পর্কে কতিপয় পুলিশ কর্মকর্তা অবশ্য বলেছে যে, দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে কিন্তু একইসাথে চাপও প্রয়োগ করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তাদের ন্যায়ের চোখ উন্মোচিত করুন। যদি এরূপ না হয় তখন বলা হবে যদিও সরকারী কর্মকর্তারা এই বর্বরতার জন্য দায়ী আর তাদের মাঝেই এটি সীমাবদ্ধ কিন্তু সরকার বা পুলিশের কর্মকর্তাদের এতে কোন হাত নেই; অর্থাৎ প্রতিবাদ আরম্ভ হবার পর তারা এমন কথা বলতে শুরু করেছে। কিন্তু যদি ন্যায় বিচার না করা হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রই এই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আমি যেভাবে বলেছি খোদার পক্ষ থেকে তকদীর প্রকাশে বিলম্ব হতে পারে কিন্তু প্রকাশ পাবে না এটি অসম্ভব। এসব লোক অবশ্যই বিভীষিকাময় (শিক্ষণীয়) পরিণতির শিকার হবেই। জামাতের ক্ষতি সাধনে তাদের যে হীন চেষ্টা ও বাসনা তা কখনো সফল হবে না। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা জামাত উন্নতি করতে থাকবে। এসব জীবন উৎসর্গকারীর কুরবানীর ফলেই আহমদীয়া জামাত পৃথিবীর দু'শতটি দেশে বিস্তার লাভ করেছে। অতএব প্রত্যেক কুরবানীর ফলশ্রুতিস্বরূপ আহমদীদের এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হওয়া উচিত যে, এটি আমাদের বিজয়ের দিন ও ক্ষণকে আরো নিকটতর করছে। ত্যাগ যত বড় হবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা তত দ্রুত বর্ষিত হবার আশা করা যায় ।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা স্বরণ করুন। তিনি কুরআন করীমে বলেন, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (সূরা আলে ইমরান: ১৪০) অর্থাৎ তোমরা দুর্বলতা প্রর্দশন করো না আর দুঃচিন্তাগ্রস্তও হয়ো না। যদি মু'মিন হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে। কাজেই নিজেদের ঈমানের সুরক্ষা আমাদের জন্য আবশ্যক। অতএব প্রত্যেক কুরবানী, প্রতিটি শাহাদত আমাদের ঈমানের উন্নতির কারণ হওয়া উচিত। তাহলে দেখবে কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারি বর্ষিত হয়, ইনশাআল্লাহ্। ধৈর্য, সাহসিকতা ও দোয়ার মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যাও। কতিপয় লোক আমাকে লিখেন, দোয়া ও ধৈর্য ছাড়াও আমাদের কিছু করা উচিত। আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি এবং সর্বদা বলে থাকি ধৈর্য ও দোয়াই আমাদের একমাত্র অস্ত্র। প্রত্যেক আহমদী যদি এর সঠিক ব্যবহার করে তাহলে দেখবেন আল্লাহ্ তা'লার কৃপা কত দ্রুত অবতীর্ণ হয়। এখনো আল্লাহ্ তা'লা আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও দোয়ার তুলনায় বহুগুণ বেশী ফল প্রদান করছেন। অতএব আমাদের দুঃখিত ও দুঃচিন্তগ্রস্ত হবার কোন কারণ নেই। যদিও শত্রুদের ষড়যন্ত্র বাহ্যতঃ ভয়ঙ্কর মনে হয় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন,'ওয়া লা তাহযান' অর্থাৎ তোমরা দুঃখিত হয়ো না। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র উবে যাবে। জামাতকে ধ্বংস করা সম্পর্কে শত্রুর সকল দুরভিসন্ধি কখনো সফল হবে না। হাঁ ঐ লোকদের দল দিন দিন ছোট হতে থাকবে হচ্ছে। তাদের মধ্য থেকেই পবিত্র স্বভাবের লোকেরা জামাতে আহমদীয়ায় প্রবেশ করতে থাকবে।

অতএব প্রতিটি ত্যাগের ঘটনা আমাদের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করে এবং করা উচিত, যে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সংখ্যালঘিষ্ঠতাকে সংখ্যা গরিষ্ঠতায় পরিবর্তন করার জন্য এই কুরবানীর মাধ্যমে আর এক ধাপ আমাদের অগ্রগামী করেছেন। প্রত্যেক কুরবানীর ফলে এমন হয় কিন্তু শহীদ কুদ্দুসের ত্যাগের মত কুরবানী জামাতকে শত শত ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণ হয় এবং হবে, ইনশাআল্লাহ্। আমাদের প্রতিক্রিয়া নৈরাশ্যও নয় আর উগ্রতাও নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার কৃত প্রতিশ্রুতির প্রতি আমাদের

পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে বরং আমরা তা পূর্ণ হতে দেখছি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এবং তাঁর জামাতকে ধৈর্য ও দোয়ার সাথে কাজ করে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন আর এরপর সফলতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
কাজেই কে আছে যে আমাদের এই ভাগ্য কেড়ে নিতে পারে যার সিদ্ধান্ত স্বয়ং খোদা তা'লা করে রেখেছেন? আমাদের দোয়া করা উচিত, কোথাও আমাদের জন্য অবধারিত বিজয়কে আমাদের অধৈর্য ও আমাদের ঈমানের দুর্বলতা দূরে ঠেলে না দেয়। এটিও স্মরণ রাখবেন! আহমদীয়া জামাত দেশ (পাকিস্তান) গড়া ও দেশের উন্নতির ক্ষেত্রেও ভূমিকা রেখেছে এবং ত্যাগ স্বীকার করেছে। আজও আহমদীদের দোয়াই দেশকে রক্ষা করছে এবং করতে পারে। আমরা দেশের জন্য প্রদত্ত আমাদের অগ্রজদের ত্যাগকে আমাদের দুঃখ-কষ্ট এবং শাহাদতের কারণে বিনষ্ট হতে দেবো না, ইনশাআল্লাহ্।

অতএব এসব অত্যাচারের অবসান কেবল একভাবেই হতে পারে আর এই দেশকে বাঁচানোর একটিই উপায়, তাহলো পূর্বের চেয়ে অধিক খোদা তা'লার দরবারে বিনয়াবনত হয়ে কল্যাণ ভিক্ষা চাওয়া। নির্যাতিত হবার পাশাপাশি যদি আমরা পূর্বের তুলনায় অধিক তাক্বওয়া, ধৈর্য, তাওয়াক্কুল, দোয়া এবং ইস্তেগফারের উপর প্রতিষ্ঠিত হই তাহলে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা বিজয়ের দৃশ্য অতিসত্ত্বর দেখতে সক্ষম হবো। আমরা পাকিস্তান এবং অন্যান্য ইসলামী দেশগুলো থেকে ধর্মের নামে নির্যাতন এবং প্রত্যেক ধরনের অন্যায়ের অচিরেই অবসান দেখবো, খোদার কাছে আমি এ দোয়াই করি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'প্রত্যাদিষ্ট এবং তাঁর জামাতের উপর ভূমিকম্প এসে থাকে, ধ্বংসের আশংকা দেখা দেয়, বিভিন্ন প্রকার বিপদাবলীর সম্মুখীন হতে হয়। 'কুযযেবূ'র এটিই অর্থ। দ্বিতীয়তঃ এই ঘটনার আর একটি উপকারিতা হলো, দুর্বল এবং দৃঢ়দের ঈমানের পরীক্ষা হয়ে যায়। কেননা যারা দুর্বল তারা শুধু স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে চেয়ে থাকে বিপদ আসলে তারা পৃথক হয়ে যায়। আমার সাথে এটিই আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত, যতক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষা না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত নিদর্শন প্রকাশ পায় না। বান্দার সাথে খোদা তা'লার গভীর ভালবাসার প্রমাণ হলো, তিনি তাদের পরীক্ষা নেন। যেভাবে তিনি (আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে) বলেন,** وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (সূরা আল্ বাকারা: ১৫৬-১৫৭) **অর্থাৎ প্রত্যেক ধরনের সমস্যা এবং দুঃখে তার প্রত্যাবর্তন খোদা তা'লার দিকেই হয় এবং খোদা তা'লার পুরস্কার তারা-ই পায় যারা দৃঢ়তা অবলম্বন করে। আনন্দময় সময় যদিও দেখতে সুমিষ্ট হয়ে থাকে কিন্তু পরিণাম কিছুই হয় না। বিলাসিতার মধ্যে থাকলে অবশেষে খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। খোদা তা'লার ভালবাসার প্রমাণ হলো, তিনি পরীক্ষায় ফেলেন এবং এর মাধ্যমে নিজের বান্দার মর্যাদাকে প্রকাশ করেন। উদাহরণ স্বরূপ কিসরা (ইরানের সম্রাট) যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে গ্রেফতারের নির্দেশ না দিতো তাহলে তার সেই রাতে মারা যাবার নিদর্শন কীভাবে প্রকাশ পেতো? আর যদি মক্কাবাসীরা মহানবী (সা.)-কে দেশান্তরিত না করতো তাহলে** فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا **'র ধ্বনি কীভাবে শোনা সম্ভব হতো। প্রত্যেকটি নিদর্শন পরীক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ঔদাসীন্য ও বিলাসী জীবনের সাথে খোদা তা'লার কোন সম্পর্ক নেই। যদি সফলতার পর কেবল সফলতাই আসে তাহলে আকুতিমিনতি এবং কান্নাকাটির সম্পর্ক একেবারেই থাকে না অথচ খোদা তা'লা এটিকেই পছন্দ করেন। তাই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়াও আবশ্যক'।**

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবার ঈমানে উন্নতি দিন এবং এ ধারা অব্যাহত রাখুন। আর আমাদেরকে বিজয় এবং সাহায্যের দিন অচিরেই দেখান। এ কুরবানী সমূহ গ্রহণ করুন আর শহীদ মরহুমের পদমর্যাদা উত্তরোত্তর উন্নীত করুন। জুমুআর নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমি শহীদের গায়েবানা জানাযা পড়াবো। তার সংক্ষিপ্ত জীবনিও তুলে ধরছি।

তার পিতার নাম মিয়া মুবারক আহমদ সাহেব। তিনি শিয়ালকোটের অধিবাসী। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার বড় দাদা মুকাররম মিয়া আহমদ ইয়ার সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে, যিনি গুজরাঁনওয়ালার ফিরোজওয়ালার অধিবাসী ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছেন আর সাহাবীও ছিলেন। একইভাবে তার বড় দাদী শ্রদ্ধেয়া মেহতাব বিবি সাহেবা (রা.)-ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীয়া (মহিলা সাহাবী) ছিলেন। মাষ্টার শহীদ আব্দুল কুদ্দুস সাহেব ১৯৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মসূত্রে আহমদী ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মুসী ছিলেন। শাহাদতের সময় তার বয়স হয়েছিল ৪৩ বছর।

তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালিখা করেছেন এরপর পিটিসি-র কোর্স করে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজত হন। শহীদ মাষ্টার সাহেবের বিয়ে গুজরাঁনওয়ালার আমীর পার্ক জনাব মাষ্টার বাশারাত আহমদ সাহেবের কন্যা রুবিনা কুদ্দুস সাহেবার সাথে ১৯৯৭ সালে হয়। যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, তিনি স্কুল শিক্ষক ছিলেন। আনুমানিক ২০ বছর ধরে এ কাজ করেছেন। সরকারি স্কুল শিক্ষক হিসেবে রাবওয়াতেই শিক্ষকতা করতেন। তার সহকর্মী এবং শিক্ষকদের ভাষ্যনুযায়ী তিনি কঠোর পরিশ্রমী এবং নিষ্ঠাবান শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন।

নুসরাতাবাদ মহল্লায় বসতি স্থাপনের আগে পূর্ব দারুর রহমতে বসবাস করতেন। দারুর রহমতে অবস্থান কালে তিনি আতফালুল আহমদীয়ার যুগে মজলিসের কাজে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নেয়ার সুযোগ পেয়েছেন। পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়কাল থেকেই তিনি জামাতের কাজ করে আসছেন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার মুন্তাযিম আতফাল এবং পরে ১০ বছর পর্যন্ত হালকা যয়ীমের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১৯৯৪ সালে নুসরাতাবাদে স্থানান্তরিত হন। এখানেও দ্রুত জামাতের কাজে যুক্ত হন। নুসরাতাবাদ মহল্লার হালকা যয়ীম এবং মজলিস সেহত এর তত্ত্বাবধানে নৌকাবাইচ বিভাগের ইনচার্জ। কুস্তি এবং সাঁতারে তিনি খুবই পারদর্শী ছিলেন। সেবার সুযোগ পেয়েছেন। আড়াই বছর পূর্বে পাড়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে খুবই উত্তমভাবে তিনি সেবা প্রদান করে যাচ্ছিলেন। মহল্লাবাসীদের মতে শহীদ মরহুম অত্যন্ত সদাচারী এবং বড় মনের মানুষ ছিলেন। কেউ কঠোর ভাষায় কিছু বললেও তিনি হাসিমুখে তা সহ্য করতেন। কর্মকর্তাদের একথা স্মরণ রাখা উচিত আর এমন গুণাবলীই প্রত্যেক পদাধিকারীর হওয়া উচিত। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার নিরাপত্তা বিভাগেও তিনি দীর্ঘসময় ধরে সেবার সুযোগ পেয়েছেন। ২০০২ সাল থেকে শাহাদত পর্যন্ত কেন্দ্রের সিকিউরিটি বিভাগের অধীনে উলুম 'বে'র ইনচার্জ ছিলেন। ডিউটিরত খোদ্দাম ও কর্মীদের সাথে খুবই বিনয়াবনত ব্যবহার করতেন। দীর্ঘসময় ডিউটিতে থাকার কারণে স্বয়ং গিয়ে তাদের খাদ্য-পানিয়ের ব্যবস্থা করতেন, চা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতেন। খোদ্দামরা তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ছিলো।

শহীদ মাষ্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেব অত্যন্ত উন্নত স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। সৃষ্টির সেবা করার একটি উম্মাদনা ছিল তাঁর মাঝে। চেনাব নদীতে কেউ ডুবে গেলে আহমদী বা অ-আহমদীর পার্থক্য না করে সঙ্গীদের নিয়ে দিন-রাত লাশ সন্ধানের কাজে লেগে থাকতেন। লাশ খুঁজে বের করা পর্যন্ত বিশ্রাম নিতেন না। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে থেকে জামাতের কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। শহীদ মরহুম আনুগত্যের ক্ষেত্রে এক আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন এবং জামাতের কর্মকর্তাদের সম্মানের প্রতি তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। ছাত্র জীবন থেকেই খেলাধুলা প্রতিযোগিতায় বড় উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তিনি অংশ নিতেন।

কাবাডি, হকি, ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি এবং নৌকাবাইচের ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। আমার সাথেও তিনি ডিউটি দিয়েছেন। ডিউটি দেয়ার সময় আমি দেখেছি, তিনি কখনো সামনে এসে ডিউটি করার মতো অতি উৎসাহ প্রদর্শন করতেন না। কোন নাম কামানো বা লোক দেখানোর অভ্যাস ছিলো না। অনেকের সর্বদা সামনে থাকার অভ্যাস হয়ে থাকে, কিন্তু তিনি ইনচার্জ হওয়া সত্ত্বেও পিছনে থাকতেন। নিজের অধিনস্তদের সামনে রাখতেন।

তার মায়ের তাকে জামেয়ায় পাঠানোর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তার সে ইচ্ছে পূরণ হয়নি। মরহুমের স্ত্রী বলেন, শহীদ খুবই মিশুক, স্নেহপ্রবণ, কৃতজ্ঞ, সহমর্মী এবং দোয়াকারী মানুষ ছিলেন। আমাদের সবার প্রতি খুবই যত্নশীল ছিলেন আর আমাদের সাথে কখনো কঠোর ব্যবহার করেন নি। দুঃখ-কষ্ট যাই হোক না কেন আত্মীয়-স্বজনের আনন্দে তাদের পাশে থাকতেন। শাহাদতের একদিন পুর্বে বাচ্চাদেরকে ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং খিলাফতের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার উপদেশ দেন। তার সন্তানদের মাঝে এটি বিদ্যমান থাকবে আমি সে দোয়াই করি। তার স্ত্রী আমাকে যে চিঠি লিখেছেন তাতে উল্লেখ করেছেন, আমার স্বামী প্রায় সময় আমাকে বলতেন, "পরে তুমি স্মরণ করবে"। অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে কিছু বলার পর এমন কথা বলতেন। শেষ সময় এই উপদেশই দিয়েছেন যে, আমার মায়ের দেখাশুনা করবে, বাচ্চাদের প্রতি খেয়াল রাখবে। তাঁর কথা তাঁর (স্ত্রীর) মনে পড়বেই। কিন্তু কদ্দুস শহীদের সাথে আমাদের এবং রাবওয়াবাসীর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া উচিত, আমরা অকৃতজ্ঞ নই। সত্যিকার অর্থে তিনি জামাতের প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন আর অনুগ্রহকারীকে জামাত কখনো ভুলে না। তার কথা সর্বদা আমাদেরও স্মরণ থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। ফোনে আমার কথা হয়েছে তার মায়ের সাথে। তিনি বেশ বয়স্কা কিন্তু দৃঢ় সংকল্পের অধিকারীনি, বাচ্চাদের সাথেও কথা হয়েছে। সন্তান-সন্ততিরাও (মাশাল্লাহ্), নিজেদের কষ্টকে ভুলে আমার খবরা-খবর নিচ্ছিলো। একইভাবে তাঁর স্ত্রীর সাথেও কথা হয়েছে। তিনিও পরম ধৈর্যশীলা ও খোদার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দান করুন এবং নিজেই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও সাহায্যকারী হোন ।

পিতামাতা বয়োবৃদ্ধ; তার পিতা এখানে হলান্ডে থাকেন কিন্তু মা ওখানে তাদের সাথেই থাকতেন অর্থাৎ কুদ্দুস সাহেবের সাথে। স্ত্রী ছাড়াও তিনি ১৪ বছরের এক ছেলে আব্দুস সালাম যে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, তের বছর বয়স্ক আব্দুল বাসেত যে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, পাঁচ বছরের আব্দুল ওয়াহাব যে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র এবং দশ বছর বয়স্কা এক মেয়ে আতিয়াতুল কুদ্দুসকে রেখে গেছেন যে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদের হাফেয ও নাসের হোন। এখন জুমুআর নামাযের পর তার গায়েবানা জানাযা পড়াবো, ইনশাল্লাহ্ তা'লা।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)